নিবেদিতার বিপ্লবী চিন্তাধারা

অজয়কুমার ভট্টাচার্য

ভগিনী নিবেদিতা বিপ্লবী; অন্তত যে-অর্থে ভারতের স্বাধীনতা-অভিলাষী দেশপ্রেমিকের কর্মকাণ্ডকে আমরা দেখে থাকি। কিন্তু এটি তাঁর বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অংশ মাত্র। তাঁর বিপ্লব-ভাবনার দৃষ্টিভঙ্গিকে যদি অল্পকথায় প্রকাশ করতে হয় তো বলা যেতে পারে, ভারতের ধর্মাগারে যে-অমূল্য অধ্যাত্মসম্পদ সঞ্চিত আছে, যা জাতির অসচেতনতায় মূল্যহীন আচারে পর্যবসিত এবং সারা বিশ্বের ভোগবাদী অস্থির জীবনযাত্রায় যার প্রয়োজন সর্বাধিক, তাকে যথার্থ মূল্যবোধে জাগরিত করে বিশ্বে ছড়িয়ে দিতে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতা আবশ্যক; আর তার জন্য প্রয়োজনীয় সমস্ত আন্তরিক কর্মকেই সমর্থন জানানো।

অবশ্য প্রথমেই রাজনৈতিক স্বাধীনতার কথা তাঁর মনে স্থান পায়নি। তিনি ইংরেজ হয়েই এদেশে এসেছিলেন, যাঁর মধ্যে ছিল উদার আধুনিক পাশ্চাত্য মনস্বিতা। ভারতীয় চিন্তা ও জীবনধারার উৎস যে বৈদান্তিক ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত, এই ভাবনার বীজ স্বামীজী তাঁর মধ্যে বপন করে দিয়েছিলেন। তবু এ-বীজটি অঙ্কুরিত হতে সময় লেগেছিল। ২৮ জানুয়ারি ১৮৯৮ কলকাতায় নেমে ৩১ তারিখে বন্ধু নেল হ্যামন্ডকে মার্গারেট লিখছেন : ''এখনও মনে ইংল্যান্ডের টুকরো জেগে, অন্তত মোম্বাসা (জাহাজ) যতক্ষণ বন্দরে নোঙ্গর ফেলে আছে। বাস্তবিক তারা কলকাতা ছেড়ে যাবার আগে আমাকে ডিনারে নিমন্ত্রণ করতে চলেছে।'' এ-টুকরোটি শুধু এতকালের বাসভূমি হিসাবে নয়, তাঁর ইংরেজ স্বাজাত্যাভিমানের গভীর শিকড় হিসাবে বহুদিন গেড়ে বসে ছিল। তিনি ইংরেজ শাসনে ভারতের মঙ্গল হবে বলেই বিশ্বাস করতেন। লন্ডনে সিসেম ক্লাবের বিদগ্ধ উদারনৈতিকতা দেখে অভ্যস্ত মার্গারেট বিশ্বাস করতেন, ইংরেজদের কর্মকুশলতার বাস্তব প্রয়োগে এ-দেশের উন্নতি ও তার বিনিময়ে এ-দেশের অধ্যাত্মসম্পদের ভাগীদার হয়ে তাদের আত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। ১০ ফেব্রুয়ারি আবার নেলকে লিখেছেন, ''এই আন্দোলন (বেদান্ত) সমগ্র ইংরেজ সাম্রাজ্যকে এক শক্ত অধ্যাত্মভূমিতে দাঁড় করাবে।... এটা নিশ্চিত যে থিয়সফিকাল সোসাইটির সভ্যেরা এই অস্থিরতার সুযোগে মানুষকে দেশদ্রোহিতার, বিদ্রোহের ইন্ধন জোগাচ্ছে।''

কিন্তু বাস্তব দৃষ্টি তাঁর এ-ধারণার পরিবর্তন ঘটাতে থাকে। আলমোড়া থেকে বন্ধু নেলকে

আবার লিখছেন, ''সাধুদের মধ্যে একজন আজ সকালে সাবধান করে গেল যে, গোয়েন্দাদের মাধ্যমে স্বামীজীর ওপর নজর রাখা হচ্ছে—যদিও আমরা সাধারণভাবে এটি জানতাম তবে এখন তা সামনে চলে এল—আর আমি এতে গুরুত্ব না দিয়ে থাকতে পারছি না, যদিও স্বামীজী হেসে উড়িয়ে দিচ্ছেন। গভর্নমেন্ট নিশ্চয় পাগল হয়ে গেছে—অন্তত তাই প্রমাণ হবে যদি স্বামীজীর কাজে নাক গলায়। তাহলে সমগ্র দেশে আগুন জ্বলে উঠবে—এবং যে-আমি আমার জাতি ও দেশের প্রতি প্রবল বিশ্বস্ত এক ইংরেজ রমণী, এখন সবে এদেশে নিঃশ্বাস নিচ্ছি, (এদেশে আসার আগে আমার নিজের এই সুগভীর দেশভক্তির সম্বন্ধে সঠিক ধারণা ছিল না)—আগে জ্বলে উঠব।'' তবে এটি মোটামুটিভাবে আবেগতাড়িত ঘোষণা কারণ এর পরেও তাঁর ব্রিটিশ শাসনের ওপর আস্থা নষ্ট হয়নি। নিবেদিতা ভারত ও ইংরেজ সংস্কৃতির এক যোগসূত্র হয়ে ওঠার স্বপ্ন দেখতেন। ৫ জুন ১৮৯৮ নেল হ্যামন্ডকে লিখছেন, ''আমার জীবনের স্বপ্ন যাতে ইংল্যান্ড ও ভারত পরস্পরকে ভালবাসতে পারে। ইংল্যান্ডের প্রতি সুবিচার করে বলতে হয় যে তার অনেক সন্তান অত্যন্ত বিশ্বস্ততার সঙ্গে ভারতের সেবা করেছে, কিন্তু ঠিক সেভাবে করা হয়নি যাতে হৃদয়ের স্বীকৃতি মেলে।'' লন্ডনের বিদগ্ধসমাজের উদার হৃদয় যে ঔপনিবেশিক ইংরেজ শাসকের তাদের নিজেদের স্বার্থেই থাকতে পারে না, এটুকু বুঝতে বেশ সময় লেগেছিল।

নিবেদিতা প্রথম ধাক্কাটা খেলেন স্বামীজীকে কাশ্মীরের মহারাজা সংস্কৃত বিদ্যালয়ের জন্য জমি দিতে চাইলে। জমি হস্তান্তরে সেখানকার ব্রিটিশ রেসিডেন্টের সম্মতি দরকার। কিন্তু ব্রিটিশের শাসন কায়েম রাখতে তাদের 'অনুগত দাসে'র প্রয়োজন যা নিজ সংস্কৃতিতে প্রতিষ্ঠিত ভারতবাসীদের দিয়ে হবে না। বরং সে-সংস্কৃতি ভেঙে চূর্ণ-বিচূর্ণ করতে হবে। তাই মিশনারি আর শাসক শ্রেণির চাপে রেসিডেন্ট অনুমতি দিলেন না। নিবেদিতা অবাক; তিনি স্বামীজীর অসাক্ষাতে রেসিডেন্টের সঙ্গে দেখা করার কথা ভাবলেন। ২ সেপ্টেম্বর এই ভাবনা প্রকাশ করে লিখলেন ওই নেল-কেই : ''আমি একজন ইংরেজ নারী হয়ে ইংরেজের এই নীচতা কী করে সহ্য করি বলো!... ইংল্যান্ডের সম্মান, যা চতুর্দিক থেকে নৈতিক বিশ্বাসঘাতকতায় আক্রান্ত, দেখে আমার অন্তর্দহন হচ্ছে।... আলমোড়াতে অ্যানি বেশান্তের সঙ্গে দেখা হতে তিনি বললেন যে ভারতে ইংরেজদের প্রভাবিত করবার কোনও আশা নেই। একমাত্র আশা ইংল্যান্ডে জনমত তৈরি করা, যাতে যাঁরা আসছেন তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি পালটায়। স্বামীজী বললেন তিনিও দুবছর আগে এই আশা পোষণ করতেন কিন্তু সে-আশা এখন নিরাশায় পরিণত হয়েছে।''

অতএব উপায়? নিবেদিতা ইংরেজ জাতির পৌরুষের উত্তরাধিকারী, আবার ভারতীয় স্বামীজীর মধ্যে সে-পৌরুষের তীব্র বিচ্ছুরণ দেখেছেন, কিন্তু এদেশের সাধারণ মানুষের সহনশীলতা, অপরাধবিমুখতা, সত্যকথন তাঁকে প্রথমে মুগ্ধ করলেও ক্রমে বুঝলেন যে এটি কাপুরুষতাজাত। স্বামীজীর ভাষায় ''হায়! এ যে মৃতের সাত্ত্বিকতা!''[১] সন্ন্যাসী স্বামীজীর কাছে পেলেন এক বিরল ঘোষণা : ''যতই বয়স বাড়ছে ততই দেখছি—সবকিছু আছে পৌরুষের মধ্যে। এই আমার নতুন বার্তা। পাপ যদি করতে চাও—পুরুষের মতো করো। বদমাশ যদি হতে চাও—বিরাট আকারে হও।''[২] নিবেদিতা বুঝলেন সাধারণ মানুষ তাদের এই সদ্‌গুণগুলি ও তার উৎস সম্বন্ধে অসচেতন বলেই এ 'মৃতের সাত্ত্বিকতা'। সত্যকথন, অপরাধবিমুখতা আসলে সমাজ, রাজা অথবা নরকের ভয়ে—সত্যপ্রিয়তা থেকে নয়, আর সহনশীলতা হল প্রতিরোধ-প্রতিবাদের অক্ষমতার কারণে। এই

সচেতনতা আসতে পারে একমাত্র শিক্ষায় আর সে-শিক্ষা ইংরেজ-প্রবর্তিত শিক্ষা নয়। ইংরেজ শাসনের প্রয়োজনীয়তা থেকে মোহমুক্ত নিবেদিতা লিখছেন (১১ জানুয়ারি ১৯০১) : ''একথা শুনতে খুবই ভাল লাগে যে, আমার দেশবাসীর সামাজিক গুণাবলি আছে। কেউ যদি নিজ পরিধির মধ্যে থাকে তাহলে পৃথিবীতে তার তুল্য কেউ নয়, অবশ্যই! কিন্তু পরিধির বাইরে গেলে তার চেহারাটা কী দাঁড়ায় সেকথা যেন ভুলে না যাই! যেসব কথাকে আমি আমাদের জাতীয় আদর্শ বলে ধরেছিলাম—তাদের অর্থ যখন দেখলাম, তা আর কিছু নয়—কেবল ইংরেজদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য, সাফল্য ও স্বর্ণশিকার—তখন হায়, আমার কাছে সবকিছু পুড়ে ছাই হয়ে গেল। আশঙ্কা হয়, আমার সম্পূর্ণ আশাভঙ্গ হয়েছে, মন চিরতরে তিক্ত হয়ে গেছে।''

স্বামীজী দেশের অসচেতন জনগণের দুর্দশা প্রত্যক্ষ করেছিলেন, আর তারই অর্ধাংশ নারীজাতির সামাজিক অবস্থান তখন ভয়াবহ। তাদের উত্তোলনের প্রয়োজনীয়তা সর্বাগ্রে—এই ভাবনাতেই তাঁর নিবেদিতাকে এদেশে আনা। কিন্তু নিবেদিতা তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা স্বীকার করেও লিখছেন (১০ জুন ১৯০১) : ''আমি কিন্তু একইসঙ্গে রাজনৈতিক প্রয়োজনকেও অত্যন্ত স্পষ্টভাবে দেখতে পাচ্ছি।... আমার এখন বিশ্বাস হয়েছে, উঠতি ভারতের জন্য, ভারতীয় পুরুষদের জন্য, আমার কিছু করার আছে।'' ইংরেজরা সংখ্যায় হয়তো ভারতের সমগ্র জনগণের এক শতাংশ, তবু তাদের শাসন, অত্যাচার, এ-জাতির শিক্ষা-সংস্কৃতির ওপর কবজা কায়েম করেছে প্রতিরোধহীন এ-জাতির মানুষদের দিয়েই। চাই জাতীয়তাবোধ, আর সে-জাতীয়তার ভিত্তি হবে ভারতের চিরন্তন আবিষ্কার বেদান্ত।

নিবেদিতা দেখেছিলেন যে, বর্ণাশ্রম ধর্ম পারস্পরিক সহায়তার মাধ্যমে এক স্বনির্ভর স্বায়ত্তশাসন ব্যবস্থা। তাতে যত আবিলতাই প্রবেশ করে থাকুক না কেন, তা দীর্ঘকাল একটা জাতিকে তাদের সংস্কৃতি নিয়ে বেঁচে থাকার রসদ জুগিয়েছে। সেখানে ব্রাহ্মণের প্রজ্ঞার আলোয় বৈশ্য ও শূদ্রের প্রয়োজনীয় বস্তুর উৎপাদন ও বণ্টন এবং ক্ষাত্রশক্তির মাধ্যমে তার পরিরক্ষণ, যা দেশের রাজা কে তা জানাটাও তাদের কাছে অবশ্য-প্রয়োজনীয় করে তোলে না। তাই রাজ্যের বৃহত্তর শাসনব্যবস্থায় পালাবদল তাদের জীবনযাত্রায় কোনও স্থায়ী পরিবর্তন আনতে পারেনি। ইংরেজরা তাদের ব্যবসার স্বার্থে সে-ব্যবস্থাকে তাদের স্বার্থের অনুকূল শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে, অর্থনৈতিক প্রলোভনের জাল বিছিয়ে, কখনও বা বলপ্রয়োগে ভেঙে দিচ্ছে। দেশীয় শিল্পের ওপর আঘাত হেনে তাকে বন্ধ করে নিজেদের শিল্পের বাজার সৃষ্টি করা হচ্ছে। এর আগে বিদেশি শক্তি এসে লুঠ করে নিয়ে গেছে অথবা দেশ দখল করে রাজত্ব করার মাধ্যমে এদেশের জনস্রোতে মিশে গেছে, কিন্তু ঔপনিবেশিক মনোভাবের সঙ্গে এদেশের পরিচয় ঘটেনি। এর সুদূরপ্রসারী ধ্বংসাত্মক প্রভাব সম্বন্ধে নিবেদিতা অবহিত ছিলেন। ১৯ জুলাই ১৯০১ তিনি মিস ম্যাকলাউডকে লিখেছেন : ''আমার মতে, জনগণ নিজেরা করেনি এমন সমস্ত কাজই মন্দ কাজ—যত চমৎকারই তাদের চেহারা হোক। দেশবাসী নিজেরা যা উৎপন্ন করে তা উত্তম, আর তাদের হয়ে যা তৈরি করে দেওয়া হয় তা হল সাজানো রঙিন প্রদর্শনী।''

শিল্পদ্রব্যের ওপর শিল্পিমনের ছাপ পড়ে, আর সে-মন গড়ে ওঠে তাদের জাতীয় আদর্শ অনুসারী সংস্কৃতির ওপর। ভারতের ক্ষেত্রে সেটি ধর্ম এবং সে-ধর্মের লক্ষ্য মোক্ষ। ভারতীয় চিত্রশিল্প, কুটিরশিল্পে প্রস্তুত নিত্যব্যবহার্য জিনিসপত্র, পূজার বাসন, মায় শ্রীকৃষ্ণের হাতে ধরা বাঁশি থেকে মা কালীর হাতে ধরা খড়্গ পর্যন্ত সে-ভাবেরই প্রকাশ।

স্বামীজীর শিক্ষায় ও তাঁর পর্যবেক্ষণক্ষমতার মাধ্যমে এ-ভাবটি আত্মস্থ করতে নিবেদিতার সময় লাগেনি। ভারতীয় ঋতু, তার প্রকৃতির মধ্যেও যেন সেই চিরন্তনতার আভাস। বেলুড় মঠের প্রথম বাড়িটিতে মিসেস বুল ও মিস ম্যাকলাউডের সঙ্গে বসবাসকালে তাঁর লিখিত বিবরণ তারই সাক্ষ্য দেয়। দৃশ্যমান যে-কোনও বস্তু থেকেই তিনি সে-ভাবনায় পৌঁছে যেতেন। স্বামীজীর সঙ্গে পাশ্চাত্যের পথে যখন শ্রীলঙ্কার পাশ দিয়ে চলেছেন দিনের শেষবেলায়, তখন লিখছেন (২৭ জুন, ১৮৯৯) : ''সারাদিন ধরে সিলোনের পূর্বতট ছুঁয়ে ছুঁয়ে যাচ্ছি। নারকেল বন, সবুজ প্রান্তর, গোলাপরাঙা আলোয় পাহাড়ের চূড়া, ঢেউ-খেলানো পাহাড়ের সারি—কী শোভা!

''এখন শান্তির লগ্ন। প্রতিদিন সূর্যের আলো যখন ম্লান হয়ে আসে, সমুদ্র যেন নিজের মনে নতুন সুরে কথা বলে। তরঙ্গের শব্দের সঙ্গে মেশে একটা করুণ কথা। প্রতি রাতে এবং সারা রাত ধরেই চলে জলের এই অস্ফুট কথা। কিন্তু আজ রাতে সমুদ্র যেন অস্ফুট স্বরে উচ্চারণ করছে একটি নাম—আর সে নামটি হল 'সীতা'। যখন বড়ো একটা ঢেউ জাহাজের গায়ে আছড়ে পড়ে, তখন ধ্বনি ওঠে : 'জয় সীতারাম! সীতারাম! জয়! জয়! জয়!' ধীরে সে সুর দূরে আরও দূরে মিলিয়ে যায়।''

ওই চিঠিতেই নিবেদিতা পরে লিখছেন, ''ভারতমাতা আমাকে তাঁর আপন সন্তানের মতো গ্রহণ করে আমার কাছে তাঁর অবগুণ্ঠনমুক্ত রূপটি মেলে ধরেছেন। সাধারণ মানুষের জীবনের অংশভাগী হওয়ার অনুমতি দিয়েছেন।

''... তার থেকেই আমার বিশেষ একটি ধারণা হয়েছে যে, এই জাতির বিচিত্র অভ্যাসের, আচার-আচরণের জন্যই অপ্রত্যাশিতভাবে তাদের মধ্যে মহৎ ব্যক্তির আবির্ভাব ঘটে।

''... ভারতে আমি এ-ও দেখেছি এই জীবন বিজ্ঞানসাধনাকেও অধ্যাত্মসাধনায় পরিণত করে।'' তাঁর বিশ্লেষণে : ''এর তিনটি সম্ভাব্য কারণ পেয়েছি। প্রথম দুটি হল হিন্দু মানসিকতায় তীব্র ভাবাবেগ এবং একাগ্রতা।... প্রাচ্য জাতির নিজস্ব এক আন্তর জীবন আছে, যা তারা একান্ত সতর্কভাবে আড়াল করে চলে এবং ইউরোপীয়েরা তার সন্ধানই রাখে না।

''... তাদের আসল প্রকৃতির বিষয়ে ইউরোপীয়ানরা যে এত অজ্ঞ তার আর একটা কারণ আছে। কারণটি হল, যে-ভাষায় বা ভাবে ভারতীয়দের অন্তর্নিহিত শক্তির প্রকাশ ঘটে, সেটি তাদের বোধের বাইরে। জাপানীরা যখন সেই শক্তি ধর্মের বদলে দেশপ্রেমের দিকে প্রয়োগ করে—তখন পাশ্চাত্য জাতি সঙ্গে সঙ্গে বুঝতে পারে।''[৩]

এই দুই ভাবনায় যে-ঐক্য আনার স্বপ্ন নিবেদিতা দেখতেন তা ভাঙতে সময় লাগেনি, কারণ ঔপনিবেশিক শক্তি তাদের নিজেদের স্বার্থেই সে-ঐক্য আনার পরিপন্থী। একটি স্বাধীন রাষ্ট্রের পক্ষেই অপর একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে এই লেনদেন ঘটানো সম্ভব। তিনি স্থির বিশ্বাসে এলেন যে, সুপ্ত জাতির এই জাতীয়তাবাদে পুনরুত্থান ও দুই জাতির পারস্পরিক বোঝাপড়া ঘটাতেও রাজনৈতিক স্বাধীনতা আবশ্যক। ১৮৯৮ সালের ২৫ মার্চ তাঁর দীক্ষা ও নামকরণ, আর ঠিক একবছর পর ২৫ মার্চ তাঁর ব্রহ্মচর্যব্রতে দীক্ষা ও সঙ্ঘে অন্তর্ভুক্তি। সঙ্ঘে থেকে তাঁর এই পথে বিচরণ স্বামীজী সমর্থন করবেন না তা তাঁর জানা ছিল, কিন্তু স্বামীজী তাঁকে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দিয়েছিলেন, তাই খানিক দ্বন্দ্বে ভরা মন নিয়ে ১৯০১ সালের ১০ জুন মিস ম্যাকলাউডকে লিখছেন : ''মহা আতঙ্কে দেখছি, আমার কাছে স্বাধীনতা মূল্যবান হয়ে উঠেছে, কারণ আমার জীবন এমন অনেক কিছু বস্তু গ্রহণ করেছে স্বামীজী সম্ভবতঃ যাদের দান করতেন না। সে

সকলই অবশ্য শেষ পর্যন্ত তাঁর জন্য নির্ধারিত—আমার তো তাই বিশ্বাস—আর এখন এই ব্যাপারের জন্য তিনি নিশ্চয় আমাকে কন্যাস্নেহে বঞ্চিত করবেন না।"[৪]

ঠিক এই মানসিক পর্বে জাপানের শিল্পাচার্য কাকুজো ওকাকুরা-র সঙ্গে আলাপ হল। তাঁর সম্বন্ধে ম্যাকলাউডের মাধ্যমে আগেই জেনেছিলেন এবং তাঁর একটি রাজনৈতিক মতাদর্শ আছে তাও জানতেন। ওকাকুরা সশস্ত্র বিপ্লবের সমর্থক ছিলেন এবং দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াকে জাপানের সহযোগিতায় ব্রিটিশমুক্ত করার পক্ষে ছিলেন। এ-ভাবনা নিবেদিতার মনে ধরে ও তিনি তাঁকে ভারতের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রধান ব্যক্তিদের সঙ্গে আলাপ করিয়ে দেন। 'এশিয়াটিক ফেডারেশন'-এর ভাবনা তখন নিবেদিতাসহ অনেককেই প্রভাবিত করেছিল। কিন্তু এক বিদেশি শক্তির সাহায্যে আর একটি বিদেশি শক্তির হাত থেকে মুক্তি যে যথার্থ স্বাধীনতা দিতে পারে না সে-সম্পর্কে স্বামীজীর দৃষ্টি পরিষ্কার ছিল। তিনি চাইতেন ভারত আত্মশক্তিতে বলীয়ান হয়ে তার নিজের পথ নিজে করে নেবে, আর তার জন্য চাই মানুষ গড়ে তোলা। ১৯০২-এর গোড়ায় বেলুড় মঠে বালগঙ্গাধর তিলককে স্বামীজী বলেছেন : ''বিদেশী শাসনাধীন আমরা। আমাদের রাজনীতিকে আত্মশক্তির উপর নির্ভরশীল হতে হবে। আমাদের পদ্ধতি অবশ্যই হবে সংঘাতশীল ও প্রতিরোধাত্মক। তা এমন রূপ ধরুক যার ফলে আমাদের শাসকরা নতিস্বীকারে বাধ্য হয়।"[৫]

নিবেদিতা প্রথমে স্বামীজীর নিষেধ মানেননি। তিনি ওকাকুরাকে এতটাই বিশ্বাস করেছিলেন যে ১৬ জুলাই স্বামীজীর মৃত্যুর পর জো-কে লিখেছেন : ''হাঁ, তুমি নিগু-র (ওকাকুরা) বিষয়ে যা বলেছ তা ঠিক। নিগু-র মতও ঠিক বলে আমার নিশ্চিত ধারণা। কিন্তু তার এবং সন্ন্যাসীদের মধ্যে পথের পার্থক্য এমন চূড়ান্ত যে, আমি মঠ থেকে পুরো বিচ্ছিন্ন। এক্ষেত্রে স্বামীজী আমাকে যে-যথার্থ মিশন দিয়েছিলেন তাকেই বহন করছি...।"[৬] কিন্তু স্বামীজীর শরীরহীন উপস্থিতি শরীরী উপস্থিতির থেকেও প্রবল। ওকাকুরার আবেগতাড়িত রাতারাতি সেরে ফেলার অন্তঃসারশূন্য কর্মনীতি নিবেদিতার মনে ধরার অন্য কোনও কারণ পাওয়া মুশকিল। তবে সে-মোহ ভঙ্গ হয়েছিল তাতে কোনও সন্দেহ নেই কারণ ১৯ নভেম্বর ১৯০২ নিবেদিতা লিখছেন : ''ভারতের জন্য আমার কাজ এতই বিশাল যে, আমি মনে করি না তাকে কয়েক মাসের মধ্যে ঠেসে দেওয়া যাবে—যেরকম প্রায় আমি কিছু আগে প্রিয় নিগুর মোহে পড়ে কল্পনা করেছিলাম।"

ওই চিঠিতেই স্বামীজীর স্মৃতির প্রবল উপস্থিতি : ''আমি প্রায়ই—প্রায়ই যেন দেখি—বসে আছি তোমাদের (মিস ম্যাকলাউডের) হল-ঘরটিতে, আগুনের ধারে, ছায়া ঘনাচ্ছে, ক্রমেই ঘনাচ্ছে, তিনি (স্বামীজী) কথা বলেই চলেছেন, অবিরাম বাণীর প্রবাহ, আর তারই মধ্যে অপরাহ্ণ কখন যে গড়িয়ে নেমে গেছে সন্ধ্যার অন্ধকারে।

''সবকিছুই ব্যর্থ মনে হচ্ছে—কেবল ব্যর্থ নয় (স্বামীজীর) সেই বিরাট জীবন। পরিপূর্ণ তার বিজয়।"[৭]

নিবেদিতা ফিরে গেলেন তাঁর পরিকল্পিত ভারতের জাতীয়তা গঠনের চেষ্টায়, যার মধ্যে বক্তৃতা সফর এবং জাতীয়তাবাদী সংগঠনের প্রতিষ্ঠা ছিল অন্যতম। তাঁর বক্তৃতার একটু নমুনা তুললে তাঁর ভাবনার গতি আমরা বুঝতে পারব। তিনি নাগপুর মরিস কলেজে আমন্ত্রিত হলেন উত্তম ক্রিকেটারদের পুরস্কার বিতরণে। সেদিন অস্ত্রপূজার দিন—দশেরার পূর্বদিবস। ভারতবাসী দেবী দুর্গাকে, তাঁর খড়্গকে, তাঁর শক্তির বাণীকে ভুলে গিয়েছে দেখে তিনি অতীব বিস্মিত—কঠোর তিরস্কার করলেন ছাত্র ও শিক্ষকদের।[৮] আমাদের শাস্ত্রে উপনিষদে শক্তির জয়জয়কার, অভীঃ মন্ত্রের প্রচার,

তাকে ছেড়ে চাকচিক্যময় বিদ্যার অনুকরণে নিজেদের দাসত্ব বৃদ্ধি! চাই জীবনে বেদান্তের মূলসূত্রগুলির প্রয়োগ ও তার বলে বলীয়ান হয়ে জাগতিক বিদ্যার আত্তীকরণ—স্বাধীন চিন্তায়, স্বাধীন ভাবনায় পুটিত হয়ে—যা সমগ্র জগতকে পথ দেখাবে।

এই ভাবনাকেই প্রাথমিকতা দিয়ে তাঁর প্রেরণায় 'বিবেকানন্দ সোসাইটি', 'বিবেকানন্দ বোর্ডিং হাউস' স্থাপিত হয়েছিল। ওই বোর্ডিং হাউসের আবাসিক প্রমথরঞ্জন পাল তাঁর স্মৃতিচারণে শঙ্করীপ্রসাদ বসুকে বলেছিলেন, কখনও কখনও সিস্টার বোর্ডিং-এ চলে আসতেন। একবার এসে তাদের অনুযোগ করলেন তারা অনেকদিন তাঁর কাছে যায়নি বলে এবং সেদিনই বিকালে আমন্ত্রণ জানালেন। কয়েকজন আবাসিক সেখানে গেলে প্রথমেই নিবেদিতা তাঁদের নবীন ময়রার রসগোল্লা খাইয়ে আনন্দ দিলেন ও কয়েকটি কথাবার্তার পর জিজ্ঞাসা করলেন ধর্ম বলতে তারা কী বোঝে। এক একজন ছাত্র এক একরকম উত্তর দিল—যার মধ্যে মানবিকতা, নৈতিকতা, ঈশ্বরে বিশ্বাস, সত্যাচরণ, পরোপকার সবই ছিল। নিবেদিতা বললেন : ওগুলো সবই ঠিক, কারণ তা সনাতন ধর্মের শিক্ষা। এছাড়া আমি আরও অধিকতর পবিত্র ও উচ্চতর সংজ্ঞা দেব। সেটি হল, তোমাদের মাতৃভূমিকে জানো, তার মানুষকে, তার সংস্কৃতিকে, তার ভাষা, সাহিত্য, আচার-অনুষ্ঠান সমন্বিত হৃৎস্পন্দনকে অনুভব করো ও তাকে ভালবাসো। এটিই তোমাদের প্রথম দায়িত্ব ও কর্তব্য, ভারতবর্ষ তোমাদের মা, তোমাদের জননী, বলো 'জননী ভারতবর্ষ', বলো বন্দে মাতরম্।

বস্তুত এই 'বন্দে মাতরম্' মন্ত্রটি বিপ্লবীদের কণ্ঠে তুলে দেওয়ার পথিকৃৎ নিবেদিতাই। তাঁর সৌম্য, শান্ত ব্যক্তিত্বে প্রয়োজনে বিদ্যুৎঝলক ও তার সঙ্গে ভারতের প্রতি অপরিসীম ভালবাসার প্রকাশ দেখে প্রথম দর্শনেই প্রমথবাবুর মনে হয়েছিল : ''মুর্শিদাবাদ সিল্কের গাউন পরিহিতা; মাথায় চূড়া-করা ঘন সোনালী রঙের চুল; গলায় বড় রুদ্রাক্ষের মালা; শান্ত সৌম্য সমাহিত দৃষ্টি। তাঁর দিকে তাকালে আপনা হতেই দৃষ্টি শ্রদ্ধায় ভক্তিতে নত হয়ে আসে। এক কথায় তাঁর হাতে একটি বীণা দিয়ে বসিয়ে দিলে সাক্ষাৎ বীণাপাণি...।"[৯]

কয়েকদিন বাদে আবার তিনি হাজির বোর্ডিং হাউসে, একটি পাঁচ ফুট লম্বা প্যাকেট নিয়ে। দারোয়ানকে দিয়ে দেওয়ালে পেরেক পুঁতে বিশাল ভারতের ম্যাপ টাঙানো হল। তার দিকে শ্রদ্ধাপূর্ণ দৃষ্টিতে তাকিয়ে তিনি ভারতের প্রাচীন সংস্কৃতি সম্পর্কে নাতিদীর্ঘ বক্তৃতা দিলেন এবং শেষে ভাবাবেগপূর্ণ কণ্ঠে বললেন : এ ম্যাপ নয়—এ তোমাদের মায়ের ছবি। ''From Kashmir to Kumarika is a living and throbbing entity.... Wherever you go, your Mother's portrait which you see here let occupy the centre of your heart and Her thoughts crowd your memory."

সবাই মন্ত্রমুগ্ধের মতো শুনছিলেন। শেষে ভগিনী বললেন, ''তোমরা সকলে এবার কিছুকালের জন্য বাহ্যদৃষ্টি বন্ধ করো; মানসচক্ষে ভারতমাতার চরণদর্শন করো; প্রণতি জানাও সেখানে। আর আমার সঙ্গে একবার কণ্ঠ মিলিয়ে বলো—বন্দে মাতরম্।" প্রমথবাবু স্মৃতিচারণে বলেছেন, ''১৯০৩ সালে একটি ছাত্রাবাসের কক্ষে যে-পূত শব্দটি উচ্চারিত হয়েছিল তা অল্পদিনের মধ্যে ছড়িয়ে পড়েছিল আগুনের মতো। নিবেদিতা বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাস থেকে মাতৃমন্ত্র তুলে এনে তার প্রাণপ্রতিষ্ঠা করে দিয়েছিলেন।"[১০]

কিন্তু নিবেদিতার এই ভাবনা কেবলমাত্র বক্তৃতাতেই সীমাবদ্ধ ছিল না। বিপ্লবীদের সঙ্গে যোগাযোগ ও তাদের সক্রিয় সহযোগিতাতেও

তিনি পিছপা হননি। বিপ্লবী অরবিন্দ তখন বরোদায়, নিবেদিতার 'Kali the Mother' পড়ে মুগ্ধ। বইটি বিপ্লবীদের শক্তি অর্জনে উদ্বুদ্ধ করত। তাঁর সঙ্গে নিবেদিতার দেখা হয় এবং তাঁকে সঙ্গে নিয়ে তিনি বরোদার মহারাজা গায়কোয়াড়ের সঙ্গে দেখা করে তাঁকে বিপ্লবীদের সাহায্য করতে অনুরোধ করেন। কিন্তু এই কর্মে জড়িয়ে মহারাজার পক্ষে ব্রিটিশের বিরাগভাজন হওয়া অসম্ভব ছিল। শ্রীঅরবিন্দ একটি কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদ গঠনের পরিকল্পনা করেছিলেন। পাঁচজনের সে-পরিষদে ব্যারিস্টার পি মিত্র, অরবিন্দ, বারীন্দ্র, যতীন্দ্র (বন্দ্যোপাধ্যায়) এবং নিবেদিতা। অবশ্য সে-পরিষদ ভেঙে যেতে দেরি হয়নি। নিবেদিতা এ-ধরনের বিপ্লব পরিষদের ব্যাপারে খুব উৎসাহী ছিলেন না। শঙ্করীপ্রসাদ বসু তার কারণ হিসাবে বেলুড় মঠের প্রাচীন সাধু ও প্রাক্তন বিপ্লবী ভরত মহারাজের কাছে শোনেন—যা আবার মহারাজ নিবেদিতার মুখে শুনেছিলেন—ওই ধরনের সংগঠনের একজনের ধরা পড়লে সেই সূত্রে অনেকের ধরা পড়ার সম্ভাবনা থাকে যা নিবেদিতার মতে ছিল অদূরদর্শিতা। বারীন্দ্রনাথ লিখেছেন, ''আমাদের বিপ্লবী যুগান্তর গোষ্ঠীর সঙ্গে তিনি জড়িত ছিলেন—তিনি সেখানেও প্রেরণার উৎস।... বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় তাঁর লেখাগুলি পরবর্তী বিরাট জাগরণ এবং বিপ্লবকে বাস্তবায়িত করার ক্ষেত্রে স্পষ্টই প্রবল প্রভাব।"[১১]

বিপিনচন্দ্র পালের 'নিউ ইন্ডিয়া' পত্রিকাতে নিবেদিতা লিখতেন। সতীশচন্দ্র মুখোপাধ্যায়ের ডন সোসাইটিতেও তিনি জ্বালাময়ী বক্তৃতা দিতেন। এক বক্তৃতায় তিনি যুবসমাজকে উদ্দেশ করে বলেছেন, ''যুবসমাজের প্রতি আমার উপদেশ, যে-কোনও মূল্যে সরকারি চাকরি বর্জন কর।... জাতীয় চরিত্রের অবনমনে সরকারি চাকরির অভিশপ্ত প্রভাব এবং ভাইয়ে ভাইয়ে বিভেদেরও কারণ—যেমন হিন্দু-মুসলমান বিভেদের। এ আমাদের কর্মের শৃঙ্খলস্বরূপ। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই এটি আমাদের নীতিবোধের বিরুদ্ধে পরিচালিত করে আমাদের অসৎ করে তোলে।... সুতরাং এসো আমরা সিদ্ধান্ত নিই যে, আমরা স্বেচ্ছায় সরকারি চাকরি গ্রহণ করে নিজেদের শৃঙ্খলিত করব না এবং নৈতিক ও দৈহিকভাবে নিজেদের দাসে পরিণত করব না।"[১২]

বক্তৃতার মাধ্যমে এরকম যুদ্ধঘোষণা সতীশচন্দ্রের পক্ষে বিপজ্জনক ছিল, হয়তো সেজন্যই নিবেদিতার সঙ্গে এই সোসাইটির সম্পর্ক ক্রমশ শিথিল হয়ে যায়।

শ্রীঅরবিন্দের ভ্রাতা বারীন্দ্রনাথের মতে ''ভগিনী নিবেদিতা চরমপন্থী নেতারূপে শ্রীঅরবিন্দের অগ্রগামী।"[১৩] তিনি আরও লিখেছেন, ''সিস্টার নিবেদিতা বাংলার এই প্রথম বিপ্লব কেন্দ্রটিকে (উপরিউক্ত কেন্দ্রীয় বিপ্লবী পরিষদকে) তাঁর লাইব্রেরির জাতীয়তা বিষয়ক প্রায় দেড়শ-দুইশ বই নিঃস্বত্ব হয়ে দিয়েছিলেন।... তাঁর অনুরোধেই ধর্ম ও কর্মযোগিনের কাজ অসমাপ্ত রেখে অরবিন্দ গ্রেপ্তার এড়াবার জন্য চন্দননগরের পথে পণ্ডিচেরী গিয়েছিলেন। নিবেদিতা বাংলার গুপ্তচক্রের সঙ্গে ছিলেন ওতঃপ্রোতভাবে জড়িত।..."[১৪]

বিপ্লবী হেমচন্দ্র কানুনগো তাঁর 'বাংলার বিপ্লব প্রচেষ্টা' বইটিতে যদিও প্রায় সর্ব বিষয়ে নেতিবাচক ও হতাশাব্যঞ্জক ছবি এঁকেছেন, কিন্তু মাসিক বসুমতীর পৌষ ১৯২৯ সংখ্যায় নিবেদিতা সম্পর্কে তাঁর উচ্ছ্বসিত প্রশংসা আছে। মেদিনীপুরে নিবেদিতা বেশ কয়েকটি বক্তৃতা দিয়েছিলেন যার মধ্যে ধর্মের চেয়ে রাজনীতির তীব্রতা বেশি ছিল বলে বেশ কিছু মানুষ সভা ছেড়ে চলে যায়। সেইসময় একজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী এ-বিষয়ে তাঁর দৃষ্টি আকর্ষণ করলে নিবেদিতা বলেন, ''আপনি আমায় ভয় দেখাবেন না। আমার শিরাতে স্বাধীন জাতির রক্ত এখনো প্রবাহিত। যারা ভয় পায়, আমার

বক্তৃতা তাদের জন্য নয়।"[১৫] হেমচন্দ্র লিখেছেন, ''তাঁকে দিয়েই আমাদের আখড়ার উদ্বোধনকার্য সমাধা হয়েছিল। তাতে তিনি যেরূপ আগ্রহ ও উচ্ছ্বাস দেখিয়েছিলেন, তা মনে হলে তাঁর প্রতি শ্রদ্ধায় প্রাণ উথলে ওঠে।... আমাদের গুপ্তসমিতির সভ্য ছাড়া আখড়ার পৃষ্ঠপোষক ও অন্য লোক এই উদ্বোধনের ব্যাপারের গূঢ় রহস্য জানতেন না।... ভগিনী নিজে তলোয়ার খেলে, মুগুর ভেঁজে, লাঠি ঘুরিয়ে ও অন্যান্য কসরত করে আমাদিগকে অনুপ্রাণিত করে দিয়েছিলেন।

''আর একদিন তিনি স্থানীয় কয়েকজন ভদ্রমহিলাদের সম্মেলনে বক্তৃতা দিয়েছিলেন। দু'একজন স্ত্রীলোককে বন্দুক ছুঁড়তেও শিখিয়েছিলেন।"[১৬]

রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় চাকরি ছেড়ে পত্রিকা-মাধ্যমে ভারতবাসীকে তার দুরবস্থা সম্বন্ধে সচেতন করতে ও ভারতকে আত্মশক্তিতে উদ্বুদ্ধ করতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। তিনি প্রথমে বাংলা কাগজ 'প্রবাসী' ও পরে ইংরেজিতে 'মডার্ন রিভিউ' প্রকাশ করতেন। নিবেদিতা এ-দুটি কাগজের সব খবর রাখতেন। তিনি নিজের কাজের জন্য একটি নিজস্ব পত্রিকার প্রয়োজন অনুভব করলেও, তাঁর বহুমুখী ব্যস্ততার মধ্যে এটি ঘটানো সম্ভব ছিল না। তিনি রামানন্দবাবুর মধ্যে সৎসাহস, সত্যনিষ্ঠা ও নিরপেক্ষতা দেখে 'মডার্ন রিভিউ'কে নিজের লেখায় ভরিয়ে তোলেন। ঐতিহাসিক যদুনাথ সরকার এই পত্রিকা সম্বন্ধে বলেছেন, ''১৯০৭ সালে—চিত্তের আলোক, স্বাধীনতা, ও মানবিক অগ্রগতির জন্য অক্লান্ত সংগ্রামকে তিনি (মডার্ন রিভিউ-তে) ইংরাজী পরিচ্ছদ পরিয়ে অধিকতর সর্বজনীন করে তুললেন।... রামানন্দ বৃহত্তর পৃথিবীর কাছে ভারতবর্ষের কণ্ঠস্বর হয়ে উঠেছিলেন।"

বলা বাহুল্য, রামানন্দের এ-কণ্ঠস্বরের পেছনে নিবেদিতার প্রভূত অবদান ছিল। এ-সম্পর্কে পরবর্তী কালে রামানন্দ বলেছেন, ''এই পত্রিকার একেবারে সূচনাকাল থেকে ভগিনী নিবেদিতা লেখা দিয়ে, উপদেশ-নির্দেশ দিয়ে, এবং অন্যান্য উপায়ে আমাদের অসামান্যভাবে সাহায্য করেছেন।" এক বক্তৃতায় নিবেদিতার কাছে তাঁর অশেষ ঋণের কথা জানিয়ে তিনি বলেন, ''একথা বললে অত্যুক্তি হবে না যে, তাঁর লেখার জোরেই আমার এই পত্রিকা দেশ বিদেশে এত বিখ্যাত হয়েছিল।"[১৭]

নিবেদিতা এ-পত্রিকার সম্পাদকীয় লিখেছেন বহুবার। তিনি স্পষ্ট ভাষায় কঠোর সত্য লিখতেন, কিন্তু দেশের রাজদ্রোহ আইনের কারণে তাকে পরিবর্তিত করতে হত। একথা বলতে গিয়ে রামানন্দ উদ্বোধনে প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলেছেন, '' 'আপনার বিবেচনার প্রতি আমার বিশ্বাস আছে'—পরিবর্তন ও পরিবর্ধন করিবার অধিকার আমাকে এই বলিয়া (নিবেদিতা) দিয়াছিলেন। তাঁহার কোনো কোনো Note আমার দ্বারা সম্পাদিত হইয়া স্বাক্ষরবিহীনভাবে প্রকাশিত হওয়ায় এখন আর তাঁহার বলিয়া সহজে ধরিবার জো নাই। যাঁহারা তাঁহার লিখনভঙ্গি ও চিন্তাধারার সহিত বিশেষ পরিচিত, তাঁহারাই ধরিতে পারেন।"[১৮]

শঙ্করীপ্রসাদ বসুর মতে, জাতীয়তা সম্পর্কে নিবেদিতার সর্বোচ্চ রচনা 'The Web of Indian Life'—যা 'ভারতীয় সংস্কৃতির সৃষ্টিশীল ব্যাখ্যারূপে সমকালে অদ্বিতীয়, বর্ত্তমানেও অংশতঃ অনতিক্রান্ত।' নিবেদিতা মনে করতেন স্বামীজী তাঁর মধ্য দিয়ে এ-বইটি লিখেছেন। মিস ম্যাকলাউডকে নিবেদিতা লিখেছেন (৯ সেপ্টেম্বর ১৯০৩) : ''প্রিয় য়ুম, তুমি যেভাবে বুঝবে সেভাবে আর কেউ বুঝবে না যে, এ-বই মোটেই আমার নয়—স্বামিজীরই বই।" বইটি আলোড়ন তুলেছিল সর্বস্তরে, যার ফলে বিরুদ্ধ সমালোচনা হয়েছিল প্রচুর। তাঁর যুক্তির বিরোধিতা করতে গিয়ে ইংরেজ পরিচালিত কাগজে যে-কুৎসা রটনা করা হয়েছিল

তার বিরোধিতা করেছিলেন উদারপন্থী ইংরেজরাই।

সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাকে ইংরেজ দেশশাসনের একটি হাতিয়ার হিসেবেই দেখত, কারণ পারস্পরিক বিভেদ জাতীয়তাবোধ আনার পরিপন্থী। তাই সরাসরি উসকানি না থাকলেও তাকে বন্ধ করার সদর্থক ব্যবস্থা নেওয়া দূরের কথা, আক্রান্তকে বাঁচাবার বা তার সম্পত্তি রক্ষা করার কোনও চেষ্টা তারা করেনি। শাসকশ্রেণির প্রশ্রয়পুষ্ট মুসলিম সাম্প্রদায়িকতা যে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতা দিয়ে রোধ করা যাবে না তা নিবেদিতা জানতেন। তিনি এ-ব্যাপারে ইংরেজ শাসনকে দায়ী করে লেখেন, ''সম্পত্তির নিরাপত্তা? নাদির শা, ল্যাংড়া তৈমুর বা অন্য লুণ্ঠকেরা কদাপি ভারত থেকে এই পরিমাণ সম্পদ কেড়ে নেননি—যা বছরের পর বছর ধরে, নিঃশব্দে, বিনা রক্তপাতে, আইনের সাহায্যে, ভারত থেকে বেরিয়ে গিয়ে হাজির হচ্ছে বিদেশের তটভূমিতে—সেখানকার মানুষদের সম্পন্ন করতে, একই সঙ্গে দুর্ভিক্ষে ও প্লেগে পরোক্ষভাবে ভারতীয় শিশুদের মৃত্যুকে টেনে আনতে।''[১৯] তাঁর নিঃস্বার্থ সত্যকথন, বজ্রকণ্ঠে অন্যায়ের বিরোধিতা ইংরেজ জাতির শুভবুদ্ধিসম্পন্ন অনেক মানুষকেই তাঁর বন্ধু ও অনুগামী করে তুলেছিল।

নিবেদিতার ভারতীয় জীবন তেরো বছর। এই স্বল্প সময়ে তাঁর বহুমুখী প্রতিভা ও নিরলস কর্মের ছাপ তিনি রেখে গেছেন, যার আলোকোদ্ধার আজও অনেক বাকি। বেদান্তের আলোয় ভারতকে নিজের পায়ে দাঁড় করাবার স্বপ্ন ও তার প্রয়োজনে ভারতের রাজনৈতিক স্বাধীনতার চিন্তা আমৃত্যু তাঁকে অধিকার করে রেখেছিল। তারই প্রকাশ দেখি তাঁর দেহাবসানের প্রাক্‌কালে বলে ওঠা সেই বিখ্যাত উক্তিতে : "The boat is sinking. But I shall see the sunrise."[২০] সে-সূর্যোদয় হয়তো এখনও যথার্থতা পায়নি, তবে তাঁর আকাঙ্ক্ষা সে-সূর্যকে ভারতের আকাশে তার দীপ্ত ভাস্বরতায় বিরাজ করাবেই—এতে কোনও সন্দেহ নেই। ভারতে তার জনগণের ভারতীয় হয়ে ওঠার বিপ্লবে নিবেদিতার অবদান নিয়ে সম্পূর্ণ কাজ এখনও হয়ে ওঠেনি, এই সার্ধশতবর্ষে পুনরায় পাদপ্রদীপের আলোয় আসা তাঁর জীবনের সামগ্রিক মূল্যায়নের প্রচেষ্টা সেই নবজাগরণের যুগের ইতিহাসকে যাথার্থ্য দেবে—এই আশা আজ অনেকেরই মনে। ✠

তথ্যসূত্র

১। শঙ্করীপ্রসাদ বসু, *নিবেদিতা লোকমাতা* (আনন্দ পাবলিশার্স : কলকাতা, ১৩৯৪), খণ্ড ২, পৃঃ ৫১

২। তদেব

৩। প্রব্রাজিকা শ্রদ্ধাপ্রাণা, *অসামান্য পত্রলেখিকা নিবেদিতা* (শ্রীসারদা মঠ : কলকাতা, ২০০২), পৃঃ ৭০-৭৩

৪। *নিবেদিতা লোকমাতা,* খণ্ড ২, পৃঃ ৮৯

৫। তদেব, পৃঃ ৯৬

৬। তদেব, পৃঃ ১০৩

৭। তদেব, পৃঃ ১০৭

৮। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৩২

৯। তদেব, পৃঃ ১৩৪

১০। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৩৭-৪০

১১। তদেব, পৃঃ ১৮৮

১২। দ্রঃ তদেব, পৃঃ ১৪৮-৪৯

১৩। তদেব, পৃঃ ১৮৬

১৪। তদেব, পৃঃ ১৮৭

১৫। তদেব, পৃঃ ১৯১

১৬। তদেব

১৭। তদেব, পৃঃ ২৯৭-৯৮

১৮। তদেব, পৃঃ ২৯৯

১৯। তদেব, পৃঃ ১৬৬

২০। প্রব্রাজিকা মুক্তিপ্রাণা, *ভগিনী নিবেদিতা* (সিস্টার নিবেদিতা গার্লস্ স্কুল : কলকাতা, ১৯৮৫), পৃঃ ৪৪৬